তারাশঙ্করের

কবি

অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ

'কবি' উপন্যাসের বীজ গল্প

তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাস ১৩৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত হবার আগে এটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৪৭ সালে প্রথমে গল্পকারে প্রকাশিত হয়েছিল। 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত এই 'কবি' গল্পটিই 'কবি' উপন্যাসের বীজস্বরূপ। 'কবি' গল্পটিতে ঝুমুরদলের কিংবা বসন্তের কোনো উল্লেখ ছিল না। ঠাকুরঝির অসুখের সংবাদ পেয়ে নিতাই চলে গেল—এই ইঙ্গিত দিয়ে গল্প শেষ হয়েছে। পাটনা থেকে প্রকাশিত 'প্রভাতী' পত্রিকার সম্পাদক মণি সমাদ্দার একটি উপন্যাসের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে 'কবি' গল্পটিকে তিনি উপন্যাসাকারে রূপ দেন। 'প্রভাতী' পত্রিকায় এই উপন্যাস ১৩৪৭ সালের চৈত্র সংখ্যা থেকে ১৩৪৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

'কবি' গল্পটির সঙ্গে লেখকের ব্যক্তি জীবনের একটি অশ্রুসজল দিক জড়িয়ে আছে। লেখক তখন থাকতেন বাগবাজারে আনন্দ চ্যাটার্জী লেন-এ। সেখানে তাঁর প্রতিবেশী হিসেবে ছিলেন চিত্র শিল্পী যামিনী রায় এবং বিখ্যাত চিকিৎসক পশুপতি ভট্টাচার্য। সেবারের পূজায় তিনি বেশ কয়েকটি গল্প লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সম্পাদকদের। তাঁর স্ত্রী উমা দেবী তখন অত্যন্ত অসুস্থ। একদিকে অসুস্থা স্ত্রীর যন্ত্রণাকাতর অশ্রুজল, অন্যদিকে তাঁর শান্ত সমাহিত চিত্তে লিখে যাওয়া। স্ত্রী তাঁকে 'দয়ামায়াহীন', 'পাষাণ' বলে নিষ্ঠুর অভিযোগ করেছেন, কিন্তু তাঁর সেবা করার সামান্য সময়ও নেই, কারণ পুজোর লেখা তাঁকে শেষ করতেই হবে। মনে মনে তাঁর সঙ্কল্প ছিল সেবার পূজায় সংখ্যায় রসোত্তীর্ণতায় সকলকে ছাড়িয়ে যাবেন তিনি। তাছাড়া কলকাতায় বাসা চালাবার খরচ, পুজোর খরচ তাকে উপার্জন করতেই হবে। সেবার দশ বারোটি গল্প লিখে আড়াইশো টাকার মতো অর্জন করেছিলেন তিনি। এভাবেই জীবন-মন্থনের গরল পান করে তিনি অমৃত-রস তীর্থের পথিক হন।

২

'কবি' তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাসগুলির অন্যতম। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর তাঁর যশ সৌরভ সাধারণের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এটি শুধুমাত্র একটি রোমান্টিক প্রেমের গল্প নয়, একটি বিশাল রাঢ় অঞ্চলের সজীব উপস্থিতিও উপন্যাসটির মধ্যে লক্ষণীয়।

উপন্যাসটি পাঠ করে বহু সাহিত্যিক সমালোচক এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন—"বাংলার একটা অঞ্চলের একেবারে মাটির গন্ধ এবং সেই মাটির নদী, মাঠ, বন জঙ্গালের সঙ্গে একেবারে অবিচ্ছিন্ন ভাবে মিশে থাকা মানুষের কাহিনি নিয়ে 'কবি' উপন্যাস।"

ড. হরপ্রসাদ মিত্র 'কবি' সম্পর্কে বলেছেন, "মানুষ এবং প্রকৃতি পরস্পরের খুবই ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখা দিয়ে 'কবি' উপন্যাসের মধ্যে এমন এক সার্থকতা ঘটিয়েছে, যা তারাশঙ্করের উপন্যাসে বিরল, কিন্তু তাঁর গল্পে মুর্হুমুর্হু যা দেখা যায়, বিশেষ একটি গোষ্ঠী বিশেষ এক ধরনের সমাজের ছবিই তিনি এঁকেছেন বটে, কিন্তু ধ্রুব, অখণ্ড মানব—সত্যের দিকে সে গল্পের উন্মুখতা চিনে নিতে দেরি হয় না।"

'কবি' উপন্যাস ও আঞ্চলিকতা

তারাশঙ্করের বহু গল্প উপন্যাস রাঢ়ের একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের পটভূমিকায় রচিত। জন্মসূত্রেই এই অঞ্চলের প্রকৃতি, মানুষ, জীবনযাত্রা, সমাজ জীবন, সংস্কার, বিশ্বাস—সব কিছুর সঙ্গেই তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ওই বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষ তাঁর বহু গল্প উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কারণেই অনেকে তাঁকে 'আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক' বলে অভিহিত করে থাকেন। আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, তাহলেও সাধারণভাবে বলা যায় যে 'কোনও অঞ্চলের প্রকৃতি, বহুকাল গত ঐতিহ্য সংস্কার, জীবনাচরণ ও সংস্কৃতি যদি সে অঞ্চলের মানুষের চরিত্রকে একটি বিশেষ রূপ দান করে, যদি সে চরিত্র একটি বিশিষ্ট ছাঁচে রূপ পেয়ে বিশিষ্ট ভঙ্গিতে কথা বলে এবং সে অঞ্চলের বাইরে যদি সে ধরনের চরিত্র পরিকল্পনা অসম্ভব হয়, তাহলে সে সাহিত্যকে আঞ্চলিক বলা চলে।" মনে রাখতে হবে প্রকৃতি যে উপন্যাসে শুধু প্রেক্ষাপটের কাজ করে তাকে 'আঞ্চলিক' উপন্যাস বলা যায় না, প্রকৃতি যখন কোনও বিশেষ অঞ্চলের মানুষের ধাতু নির্মাণে ও অন্তর্প্রকৃতি নির্মাণে সর্বতোশায়ী প্রভাব বিস্তার করে তাকে একটা বিশেষ রূপ দান করে তখন তা হয়ে ওঠে আঞ্চলিক। এই কারণে শৈলজানন্দের 'কয়লা কুঠির দেশ' আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত হলেও সর্বাঙ্গসুন্দর আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। আসানসোল ও রাণীগঞ্জের কয়লাখনির অন্ধকার গহ্বরে কর্মরত আদিবাসী যুবক-যুবতীর মর্মান্তিক হৃদয়ার্তি ফুটে উঠলেও তাদের মানস প্রকৃতি ওই অঞ্চলের প্রকৃতি দ্বারা গঠিত নয়। তাদের দেহ মন গঠিত হয়েছে অন্য অঞ্চলে ; শুধু কর্মসূত্রে তারা জড়ো হয়েছে কয়লা-কুঠিতে। খনি অঞ্চলের জীবন-প্রণালী সম্পর্কে শৈলজানন্দের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল, ওই অঞ্চলের জীবন-চিত্রণে তিনি বিশেষ পারদর্শিতাও দেখিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের পথিকৃৎ তিনিই। তবু তাঁর 'কয়লাকুঠির দেশ' আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে কিছু ত্রুটি বহন করছে। অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস ছিল বিক্রমপুরের মালপদিয়ায়। সেখানে তিনি পদ্মানদীকে, পদ্মাতীরবর্তী মানুষকে, পদ্মানদী নির্ভর জেলে মাঝিদের জীবনযাত্রাকে অতি কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দুঃস্থ অসহায় মানুষদের জীবন সংগ্রাম দেখেছিলেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব জীবন রূপায়ণ 'পদ্মানদীর মাঝি'। একটি বিশেষ অঞ্চলের জেলে মাঝি তাদের সার্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপন্যাসটিতে হাজির হয়েছে।

সুতরাং আঞ্চলিক উপন্যাস কাকে বলে তা বিচার করতে গেলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। প্রথমত, এই ধরনের উপন্যাসে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় থাকে। রাস্তাঘাট, জলাশয়, বিশেষ জনপদ, বৃক্ষ মাটি, শস্যশ্যামল মাঠ, নদ-নদী, অরণ্য সবকিছুই অর্থাৎ স্থানিক পরিচয়টাই এখানে প্রধান হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, যে চরিত্রগুলি এখানে স্থান পায়, সেই চরিত্রগুলি উক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে রস ও পুষ্টি আহরণ করে এমনভাবে বেড়ে ওঠে যে তাদিকে ওই পরিবেশ

থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যদি বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে তারা নিষ্প্রভ ও ম্লান হয়ে যায়। তৃতীয়ত, ওই বিশেষ অঞ্চলের লোকগাথা, ছড়া, গান, সংস্কার, উৎসব, ব্রত, মেলা, পূজা-পার্বণ এতে অনায়াসে স্থান পেয়ে যায়, ফলে উপন্যাসগুলি সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। চতুর্থত, ভাষা ও সংলাপ, স্থানীয় প্রবাদ প্রবচন, উচ্চারণ ভঙ্গীমার বিশেষত্বও আঞ্চলিক উপন্যাসে ফুটে ওঠে।

পাশ্চাত্যদেশে বহু উৎকৃষ্ট আঞ্চলিক উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে। এরস্কিন কলডওয়েলের 'od's little Acre', 'Tragic ground', 'Tobbaco Road' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ অঞ্চলের দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষের মর্মন্তুদ জীবন কাহিনির ইতিহাস। ষ্টেইনবেকের 'The long Valley' তার অধিকাংশ উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি। ইংল্যান্ডের ইর্য়কশায়ার অঞ্চলের প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপট ও সেখানকার মানুষের জীবন কাহিনি ব্রন্টি বনেট ভগিনীদের উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। আর টমাস হার্ডির উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে 'এডগন হীথ' অঞ্চলের (যাকে ওয়েসেক্স অঞ্চল বলা হয়) প্রকৃতি এবং মানুষ। তাঁর 'Return of the Native' এবং 'Mayor of Casterbridge' আঞ্চলিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তবে হার্ডির উপন্যাসে "Wessex is an area not on the map of Englond alove, It is the area of Hardy's inaginative inspiration."

বাংলা সাহিত্যে 'কয়লাকুঠির দেশ' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' ছাড়াও বহু আঞ্চলিক উপন্যাস লেখা হয়েছে। মুরশিদাবাদের পশ্চিমাংশে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের বৈষ্ণবদের নিয়ে লেখা সরোজ কুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী', চব্বিশ পরগনা জেলার ইছামতী নদীর দুপারে বনগাঁ-যশোর অঞ্চলের মানুষের বিচিত্র জীবনকথা নিয়ে রচিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী', তিতাস নদীর তীরে মালো সম্প্রদায়ের অনাড়ম্বর জীবনের ইতিহাস নিয়ে লেখা অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম', বাদাবনের রহস্যময় জীবন ও অরণ্যপ্রকৃতি নিয়ে লেখা মনোজ বসুর 'জল জঙ্গাল, মুর্শিদাবাদের হিজলবন ও দ্বারকানদীর পটভূমিতে সৃষ্ট সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'তৃণভূমি', পদ্মাচরের চাষিদের জীবন নিয়ে রচিত অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম' প্রভৃতি আঞ্চলিক পটভূমিকায় লিখিত। এছাড়া প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী' (ভারতের পূর্বসীমান্তে নাগাদের বিচিত্র জীবন গাথা), সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' (মানভূমের আদিবাসীদের জীবন নিয়ে লেখা), রমাপদ চৌধুরীর 'বনপলাশীর পদাবলী' (কাটোয়ার খড়ি নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবনকথা), অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড' (উত্তরবঙ্গের পটভূমিকায় রচিত) প্রভৃতি আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত।

তবে বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি আঞ্চলিক উপন্যাসের স্রষ্টা তারাশঙ্কর। তাঁর জন্ম বীরভূমে, রাঢ় অঞ্চলে। এই রাঢ় অঞ্চলের মানুষ, প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা। ফলে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে রাঢ় অঞ্চল, সেখানকার মানুষ ও প্রকৃতি স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। তাঁর 'কবি', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' বিখ্যাত আঞ্চলিক উপন্যাস। যদিও তাঁর অন্যান্য বহু উপন্যাসে আঞ্চলিকতার ধর্ম প্রবলরূপেই বিদ্যমান। আঞ্চলিক উপন্যাসে তারাশঙ্করের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল এই যে তিনি শুধু রাঢ়ের বহিরঙ্গ রূপটি অঙ্কন করেন

নি ; তিনি ওই বিশেষ অঞ্চলের আঞ্চলিক জীবনের অন্তরঙ্গ রূপটিকে তুলে ধরেছেন। এইখানেই তাঁর অনন্যতা।

এই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ জীবন কেমনভাবে তাঁর উপন্যাসে ফুটে ওঠে মাত্র দুটি উপন্যাস বিচার করলেই তা অনুধাবন করা যাবে। যেমন তাঁর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি। এটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। এর স্থানিক ও ভৌগোলিক পরিচয়টি উপন্যাসের প্রথমেই স্পষ্ট করেছেন—'কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক—অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মতো। বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপায়ের গিরিমাটি গোলা জল ভরা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয় শ্যামলা মায়ের গলায় সোনার হাঁসুলী, কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জল যখন পরিষ্কার সাদা হয়ে আসে—তখন মনে হয় রুপোর হাঁসুলী। এই জন্য বাঁকটির নাম হাঁসুলী বাঁক। নদীর বেড়ের মধ্যে—হাঁসুলী বাঁকে ঘন বাঁশবন ঘেরা মোটামুটি আড়াই-শো বিঘা জমি নিয়ে মৌজা বাঁশবাদি, লাট—জঙ্গলের অন্তর্গত।"

এই কোপাই নদী, হাঁসুলী বাঁক, বাঁশবাদি গ্রাম তাঁর ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে আজও বিরাজমান। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যুগের প্রয়োজনে, ৬০/৭০ বৎসরের ব্যবধানে, বাঁশবাদির বাঁশঝাড়, বটগাছ, কর্তাঠাকুরের তানের বেলগাছ, সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিন্তু এককালে যে এ সবের অস্তিত্ব ছিল, চরিত্রগুলিও যে বাস্তব ছিল, তা প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক তপন সিংহের কথায় জানা যায়। তিনি লিখেছেন—"তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', আমি এই ছবি করতে চাওয়ায় তারাশঙ্করদা খুব খুশি হয়েছিলেন। আমাকে সঙ্গে করে মূল কাহিনির পটভূমি লাভপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন লোকেশন দেখাবার জন্যে। সেই কোপাই নদী যেখানে হাঁসুলীর মতো বাঁক নিয়েছে, সে সব দেখালেন। মূল চরিত্রদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ওই সব দেখে আমার এত ভালো লাগলো যে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে নিলাম এদের এইসব বাড়িতেই শুটিং করব। সেই যে পুরুষ অথচ মহিলা সেজে ঘুরে বেড়ায় সেই আসল নসুবালাকে দেখালেন।"

কিন্তু একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমারেখা 'আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বটে, কিন্তু একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। কোপাই নদীর তীরে হাঁসুলী বাঁকে বাঁশবাদি গ্রামে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ কাহারদের যে বিচিত্র জীবনলীলা—সে জীবনলীলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভূত প্রেত, তন্ত্র মন্ত্র, অশরীরী আত্মা, অপদেবতার ভয়, প্যাঁচা ও তক্ষকের ডাক, সাপের হিস্ হিস্ শব্দ ; জড়িয়ে আছে যুগ সঞ্চিত অজ্ঞানতা ও সংস্কারের কালো মেঘ। সেখানে কাহাররা শুনতে পায় ঘন জঙ্গলের মধ্যে 'ব্রহ্মদত্তি' বা 'বেলবনের কত্তার' শিস্ ; দেখতে পায় বাবার আকাশে 'হাতীনামা', কিংবা কোপাইয়ের বন্যায় বড়ো মশাল জ্বালিয়ে যক্ষের নৌকার আসা যাওয়া। সেখানকার জগৎ দৈব লীলায় আচ্ছন্ন। সেখানে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, জন্ম, মৃত্যু, বিপদ ভয়, সবই অদৃশ্য দেবতার অঙ্গুলি সংকেতে নিয়ন্ত্রিত। সেখানে থাকে অশীতিপর বৃদ্ধা সুচাঁদ। সে দৈবশক্তির অধিকারিণী, ব্যাখ্যাদাত্রী।

সে অভ্রান্ত গণনার মাধ্যমে আগামী বিপদের আভাস দেয়, দেবতার রোষের ইঙ্গিত দেয়। যে মাটিতে কাহারদের জন্ম যে মাটি তাঁদের রঙ্গাস্থল সেই মাটি ও চারপাশের পরিবেশ থেকে তাদের বিশেষ করে তাদের প্রতিনিধি বনোয়ারী এবং ভাগ্য গণনাকারী সুচাঁদকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তারা এই মাটিরই ফসল। এইভাবে ভূমি ও ভূমি-পুত্ররা যে আঞ্চলিক উপন্যাসে একাত্ম হয়ে যায় তাকেই শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাস বলা হয়।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' তারাশঙ্করের আর একটি বিখ্যাত উপন্যাস। এরও স্থানিক পটভূমি স্পষ্টভাষায় অঙ্কিত। একদিকে গঙ্গা, অন্যদিকে হিজল বিল, মাঝখানে বিষবেদেদের বাসভূমি সাঁতালী গ্রাম। 'হিজল বিল' কথাটির অর্থ হল জলা জায়গা। বীরভূমের সীমান্তে গঙ্গার ধারে হিজল বিলের অস্তিত্ব আজও রয়েছে। লেখক বলেছেন—'হিজল বিল তিনি দেখেন নি, শুনেছেন'। হিজলবিল না দেখলেও লাভপুরের অদূরে 'লাঙ্গালহাটার বিল' তাঁর অপরিচিত ছিল না। এই বিলের ধারে ভাগীরথীর চরভূমি। কাসবন, ঝাউবন, দেবদারু বন। এরই মাঝখান দিয়ে পথ চলে গেছে সাঁতালী গাঁয়ে বিষহরি মায়ের 'থান' পর্যন্ত। এই বিল, এই গ্রাম, এই চরভূমির চারদিকেই বিষধর কালনাগিনীদের বাসভূমি। এই ভয়ংকর নাগিনীদের সঙ্গে যাদের জীবন ও জীবিকা জড়িত তারা হল বেদে সম্প্রদায়। এই বেদেদের সম্পর্কে তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। বহু বেদেকে, এমনকি নাগিনী কন্যা 'শবলা'কে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। এদেরই জীবনকথা রূপ পেয়েছে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-তে। বেদে সমাজের আদিম রীতি-নীতি, তাদের প্রথা, সংস্কার, জীবন ও জীবিকার বিচিত্র পদ্ধতি, রাঢ় দেশের হিজল বনের আঞ্চলিক পটভূমিকায় এমনভাবে প্রতিবিম্বিত ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন যে, তাদিকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করলেই তা নিষ্প্রভ ও ম্লান হয়ে যাবে। আঞ্চলিক পটভূমি এবং পটভূমি নির্ভর মানব চরিত্র—এই দুয়ের নিবিড় বন্ধন থাকে বলেই আঞ্চলিক উপন্যাস সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়।

২

তারাশঙ্করের 'কবি'ও আঞ্চলিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে বীরভূমের একটি গ্রামের অন্ত্যজ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ডোমজাতির সন্তান নিতাই কবিয়ালের জীবন কাহিনি রূপায়িত হয়েছে। নানা দিক দিয়ে রাঢ়ের এই ছোট্ট গ্রামখানির একটা বিশিষ্টতা আছে। গ্রামটির নাম অট্টহাস—একান্ন মহাপীঠের অন্যতম। প্রবাদ আছে এখানে সতীর অধরোষ্ঠ পড়েছিল। গ্রামটিকে ফুল্লরার মহাপীঠ বলেও উল্লেখ করা হয়। এখানে যে মন্দির আছে তাতে একটি বৃহৎ শীলা ফুল্লরা ও অট্টহাস উভয় নামেই পরিচিত। 'কবি' উপন্যাসের দেবী চণ্ডিকা এই মন্দিরেরই দেবী। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমায় ঘটা করে চামুণ্ডার পূজা হয়। সেই উপলক্ষ্যে গ্রামে মেলা বসে, মেলায় যাত্রাগান, কবিগান ও ঝুমুর গানের আসরও বসে। গ্রামে জমিদার, নায়েব, গোমস্তা থেকে শুরু করে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণির মানুষ—সবাই জড়ো হয় এই আসরে। ফলে আসরটি হয়ে ওঠে মহামিলনের কেন্দ্রভূমি।

এই গ্রামেরই একপ্রান্তে বাস করে বাউড়ী ও ডোম জাতীয় নিম্নশ্রেণির মানুষ।

পুরুষানুক্রমে চুরি ডাকাতি দুস্যবৃত্তিতে তারা অভ্যস্ত। বয়প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা দীক্ষা নেয় এই বংশগত পেশায়। মদ্যাসক্তিও তাদের প্রবল। এদের মধ্যে কেউ জেল খাটে, কেউ জেলে পচে মরে। এর জন্যে তাদের কোনও লজ্জা বা সংকোচ বোধ নেই। বরং যারা এই পেশা গ্রহণ করে না তারা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পাত্র হয়, ভীরু ও দুর্বল অপবাদে ভূষিত হয়।

গ্রামটির অদূরে লাভপুর স্টেশন। আহমদপুর কাটোয়া লাইনের একটি ছোটো স্টেশন। তারাশঙ্করের উপন্যাসে এই লাভপুর স্টেশনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। 'কবি' উপন্যাসের নায়ক নিতাই-এর বন্ধু রাজন এই স্টেশনেই পয়েন্টস্‌ম্যানের কাজ করত। বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে নিতাই এই স্টেশনেই কুলিগিরির কাজ করত। মাথায় মোট নিয়ে গ্রামে, গ্রামান্তরে চলে যেত।

স্টেশনের মধ্যেই ছিল বেনে মামার চায়ের দোকান। দোকানটিকে ঘিরে রীতিমত আড্ডা বসত। বাতে পঙ্গু বিপ্রপদ (বাস্তবে লেখকের বন্ধু দ্বিজপদ) এই চায়ের দোকানে বসে বিনা পয়সায় চা খেত। নিতাইকে 'কপিবর' বলে সম্বোধন করত, এই নিয়ে অনেক মান-অভিমানের খেলা চলত উভয়ের মধ্যে। এই চায়ের দোকানে দুধ দিতে আসত ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝির আসতে দেরি হলে বেনে মামা দোকানের সামনে প্লাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে থাকত। নিতাইও একটু এগিয়ে গিয়ে শান্টিংপয়েন্টে দাঁড়াত। উভয়েরই দৃষ্টি রোদ ঝকঝকে লাইনের উপর একটি বিশেষ জায়গায়—আধমাইল দূরে যেখানে রেললাইনটি পূর্ব থেকে দক্ষিণে মোড় নিয়েছে, যেখানে দুটো লাইন মিলে গিয়েছে একটি বিন্দুতে। হঠাৎ সেই বিন্দুর ওপর ভেসে উঠত রৌদ্র প্রতিফলিত দুধের ঘটির ছটা। দেখা যেত ক্ষীণতনু-চলমান ঠাকুরঝিকে।

বসনদের ঝুমুরের দলটিকে এই স্টেশনে জোর করে টেনে নামিয়েছিল রাজন। তারা আস্তানা গেড়েছিল স্টেশনের পাশেই। সেখানেই ঝুমুর দলের আসর বসেছিল। নিতাইয়ের জীবন নাট্যের গতি পরিবর্তন হয়েছিল স্টেশন-সংলগ্ন কোয়ার্টার থেকেই। স্টেশনের কাছেই কৃষ্ণচূড়া গাছ—এই গাছতলাতে বসে পূর্বদিকে রেললাইনের দিকে তাকিয়ে থাকত নিতাই, দেখত ঠাকুরঝি আসছে কিনা। এই কৃষ্ণচূড়া গাছকে কেন্দ্র করেই নিতাই—ঠাকুরঝির প্রেমের শতদল পদ্ম একটু একটু করে বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

"নিতাই এখনও দাঁড়াইয়া আছে কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায়। ফাল্গুনের দ্বিপ্রহরের দিকচক্রবাল ধুলার আস্তরণে ধূসর হইয়া উঠিয়াছে, সেই উতলা বাতাস ধুলা উড়াইয়া লইয়া বহিয়া যায়, যেন দূরের নদীর প্রবাহের মতো। নিতাইয়ের মন এখনও চঞ্চল। সে এখনও সেই ঝাপসা আস্তরণের মধ্যে যেন একটি স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল দেখিতে পাইতেছে। সে স্থির দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া গুনগুন করিয়া গান ভাঁজিতেছিল। নিজেরই এক সময়ে মনে প্রশ্ন জাগিল—কেন সে এমন করিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে? ওই মেয়েটি তাহার কে? মনই বলিল—'কে আবার মনের মানুষ'। মনের মানুষের জন্যই সে পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে।"

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে তারাশঙ্করের অন্য একটি গল্প 'তমসা'র অন্ধ পঙ্খী এই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলাতে বসেই ভিক্ষে করত। কালের করাল গ্রাসে কৃষ্ণচূড়া গাছটি আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তারাশঙ্করের সাহিত্যে গাছটি জীবন্ত হয়ে রইল। স্টেশন থেকে মাইলটাক দূরে কূয়ে নদী। এই নদী অতিক্রম করে ঠাকুরঝি আসত প্রতিদিন দুধ নিয়ে। নিতাইয়ের দেওয়া হার গলায় পরে ঠাকুরঝি এই নদীর স্বচ্ছ অগভীর জলস্রোতে নিজদেহের কম্পিত প্রতিবিম্ব দেখেছিল মুগ্ধ নেত্রে।

লাভপুর গ্রামকে কেন্দ্র করে চারপাশে যেসব গ্রাম ও মাঠের নাম—প্রবাদ ও জনশ্রুতিকে নির্ভর করে বেড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ আছে 'কবি' উপন্যাসে। যেমন—'জামাইমারীর মাঠ'। নিতাইয়ের পিতামহ নিজের জামাইকে রাতের অন্ধকারে চিনতে না পেরে পথিক ভেবে হত্যা করেছিল। সেই থেকে মাঠটির নাম হয়েছে জামাইমারীর মাঠ। সেই মাঠ অট্টহাস গ্রাম থেকে ক্রোশ খানেক দূরে। এমনিভাবেই এসেছে 'উদাসীর মাঠ'। বহুকাল আগে লাভপুরে এক বাউড়ি রাজার বাস ছিল। তার স্ত্রীর নাম ছিল উদাসী। সেই উদাসীর নামানুসারে মাঠটির নাম হয়েছে 'উদাসী'। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'নিমচের জোল', 'কাশীর পুকুর' 'কালীবাগান'। এইসব বাগান, জোল, মাঠ পুকুরের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। তীর্থ ভ্রমণ শেষ করে নিতাই যখন ট্রেনে করে বাড়ি ফিরছে, তখন সে অনুভব করছে মাতৃভূমির তীব্র টান। তখন তার চোখ ভাসাইয়া জল আসিতেছে অজয়ের বানের মতো। মাগো—মা, আমার মা। আমার গাঁ। ওই যে 'নিমচের জোল', 'উদাসীর মাঠ'—ওই যে কাশীর পুকুর—ওই যে কালী-বাগান—যে বাগানের গাছগুলি ছিল তাহার কবি জীবনের গানগুলির প্রথম শ্রোতার দল।'

গোটা রাঢ় দেশ জুড়ে নানা ধরনের মেলা হয়। তার মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে আলেপুরের মেলা। প্রতি বছর রাস পূর্ণিমায় এই মেলা বসে। মেলাটিকে কেন্দ্র করে যাত্রা, কবি পাঁচালি ও ঝুমুর গানের আসর বসে। কাতারে কাতারে লোক জড় হয়। এই মেলায় একটি ঝুমুর দলের আসরে কবিয়াল হিসেবে গান গাওয়ার জন্য নিতাই আলেপুর এসেছিল। এই উপন্যাস তারাশঙ্কর যে ভ্রাম্যমাণ ঝুমুরদলের কথা বলেছেন তা এই রাঢ় অঞ্চলের বিশিষ্ট সম্পদ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে অঞ্চল বিশেষের পটভূমি আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য তা 'কবি' উপন্যাসে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। অট্টহাস গ্রাম, লাভপুর স্টেশন, কৃষ্ণচূড়া গাছ, কুয়ে নদী, উদাসী মাঠ, আলেপুর গ্রাম—এই আবেষ্টনীর মধ্যে নিতাই-এর আনাগোনা। ঝুমুর দল, রাসমেলা, যাত্রা গান প্রভৃতি রাঢ় অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির অঙ্গাগুলি-ও উপন্যাসটির মধ্যে যথাযথ ভাবে রূপায়িত। কথা বলার বিশিষ্ট ভঙ্গি অর্থাৎ কথ্যভাষার একটি বিশেষ টান যা এই অঞ্চলের মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য নিতাইয়ের মধ্যে তা দেখা যায়। সজনে গাছ, লাইনের ধারে ও গ্রামের আশপাশে বন আউচের গাছ, চিরোল চিরোল পাতার ফাঁকে ফাঁকে লাল ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়া গাছ, কদম ফুলের সমারোহ—এই অঞ্চলের গ্রামগুলিকে একটা শ্রী এনে দেয়। এই সব গ্রামের বৃক্ষ শাখার ঘন পল্লবের অন্তরাল থেকে শোনা যায় কোকিল, বউ কথাকও, চোখ গেল পাখির কণ্ঠস্বর।

এই প্রাকৃতিক পরিবেশে নিতাইয়ের যৌবন বিকশিত হয়েছে, তাঁর প্রেমের উন্মেষ ঘটেছে। রাঢ় অঞ্চলের জল হাওয়া মাটি সংস্কৃতি পুষ্ট নিতাইয়ের দেহমন—রাঢ়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যেই গুণান্বিত সে। এই গ্রাম, এই পরিবেশ থেকে যদি নিতাইকে সরিয়ে আনা হয় তাহলে হয়তো অন্য একটা কবিয়ালের সন্ধান মিলবে, কিন্তু নিতাই কবিয়ালের নয়। সুতরাং বহিরঙ্গ, ও অন্তরঙ্গ উভয় দিক দিয়েই 'কবি' আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে উঠেছে।

তবে এটাই শেষ কথা নয়। আঞ্চলিক উপন্যাসের ধর্মের প্রতিষ্ঠিত থেকেও এই উপন্যাস যে চিরন্তন মানবধর্মকে প্রকাশ করতে পেরেছে, একটা মহত্তম জীবনসত্যে উন্নীত হতে পেরেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানেই 'কবি' উপন্যাসের সার্থকতা।

চরিত্র বিচার

● নিতাই ঃ

'কবি' উপন্যাসের নায়ক নীচ বংশজাত অল্পশিক্ষিত কবি নিতাইচরণ। সমগ্র উপন্যাসে তারই জীবনের ক্রমবিকাশের কাহিনি এবং পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। নিতাইয়ের চরিত্রটি লেখকের বাস্তব-অভিজ্ঞতা প্রসূত। তার বাল্যকালে দেখা সতীশ ডোমের চরিত্রের আদলে রচিত। তিনি তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে বলেছেন—

"কবি গল্পটির আরম্ভ নিতাইকে নিয়ে। নিতাই চরিত্র একটি সত্যকার মানুষের ছায়া দিয়ে তৈরি। আমাদের গ্রামের সতীশ ডোম ছিল এই ধরনের পাগলাটে কবি যশঃপ্রার্থী মানুষ। কালো আবলুশের মতো রং, অল্পস্বল্প পড়তে পারে। স্টেশনে কুলিগিরি করে আর পথে ঘাটে আপন মনে কবিগান গেয়ে বেড়ায়। লোকের সঙ্গে সাধুভাষায় কথা কয়, বলে—প্রভু একবার গগনের পানে অবলোকন করেন, দিনমণির তেজটা দেখেন। আপনি প্রভু পাদুকা পরে ছত্রমস্তকে হাঁটবেন, আমাকে মোট মস্তকে শূন্যপদে গমন করতে হবে। দুঃখীর দুঃখটা চিন্তা করে দেখে বাক্য বলুন। ইত্যাদি।

একদিন সতীশকে দেখলাম, একটা জনশূন্য আমবাগানে আমগাছগুলিকে শ্রোতা ধরে নিয়ে একটি হাত কানে দিয়ে, একটি হাত নেড়ে ঈষৎ কুঁজো হয়ে কবিগান করে চলেছে। এই চরিত্রটা নিয়ে আরম্ভ করলাম।...

সতীশের বংশ পরিচয় যা দিয়েছি তাতে একটুকু অতিরঞ্জন নেই। সতীশ কবিযশ প্রার্থী ছিল—এই আকাঙ্ক্ষাতেই সে ওই পরিবার ও গোষ্ঠীগত চৌর্যবৃত্তির প্রভাব থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য স্টেশনে এসে রাজা পয়েন্টস্‌ম্যানের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। পাঁচ সাত মাইলের মধ্যে যেখানে কবিগান হোক, মাথায় চাদর জড়িয়ে জামা একটা গায়ে দিয়ে সতীশ যেতই এবং আসরে কবিয়ালের দোহারদের পাশে বসে সুরে সুর মিলিয়ে দোয়ারকি করত। মধ্যে মধ্যে ফোড়ন দিত।... আমার গ্রামে বা গ্রামের কাছাকাছি যে সব মেলা হয়, সেসব মেলায় আমি সতীশকে এইভাবে দোয়ারকি করতে এবং ফাঁক পেলে সেই ফাঁকে নাক গলিয়ে মুখ বাড়িয়ে কানে হাত দিয়ে ঈষৎ সামনে ঝুঁকে দু'চার কলি গাইতেও দেখেছি। প্রতিপক্ষ ঝুমুরদলের মেয়েদের ব্যঙ্গ করতেও শুনেছি। আবার দুরদূরান্তরের মেলা থেকে ফেরার সময় ভোরবেলায় স্টেশনের পথে তাকে মাথায় চাদর বেঁধে উচ্চকণ্ঠে গান গেয়ে ফিরতে দেখেছি।"

তারাশঙ্কর সতীশ ডোমের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কথা বলার ভঙ্গি বা বংশ পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গে 'কবি' উপন্যাসে বর্ণিত নিতাই চরিত্রের হুবহু মিল লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং নিতাই চরিত্র কোনও কাল্পনিক চরিত্র নয়। বরং নিজের চোখে দেখা একটি বাস্তব চরিত্রকেই তিনি তার উপন্যাসে নায়ক চরিত্র রূপে উপস্থাপিত করেছেন।

নিতাইয়ের যে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল অতি পঙ্কিল ও ঘৃণ্য জীবন থেকে শান্ত ভদ্র জীবনে উত্তরণের আপ্রাণ চেষ্টা। তার পিতৃকূল ও মাতৃকুল উভয় কুলই নৃশংস ডাকাতি ব্যবসায় লিপ্ত—তাদের মধ্যে অনেকে জেল খেটেছে, কেউ

জেলে পচে মরেছে। নিতাই এ জীবনে কোনও আকর্ষণ বোধ করেনি, বরং সযত্নে পরিহার করবার চেষ্টা করেছে। জমিদার প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয়ে কয়েক বছরের শিক্ষা এবং তার সহজাত কবি প্রতিভা তার উচ্চারণের পথকে অনেক সহজ করেছে। চৌর্যবৃত্তির প্রতি তীব্র ঘৃণা ছিল বলেই ঘনশ্যাম গোসাই-এর বাড়িতে মহিন্দারের কাজ সে ছেড়ে দিয়েছে এক মুহূর্তেই। কারণ সে দেখেছিল আপাত গোঁসাই জীবনের অন্তরালে ঘনশ্যাম ধান চুরির মতো হীন কার্যে লিপ্ত। এখান থেকে সে চলে আসে উদার প্রাণ বন্ধু স্টেশনের পয়েন্টস্‌ম্যান রাজুর কাছে। পেশা হিসেবে সে গ্রহণ করে কুলিগিরি, অবসর সময়ে সে রচনা করে গান, কবিয়াল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার নীরব সাধনা। তার স্বপ্ন তারিণী মণ্ডলের মতো কবিয়াল হওয়ার। এই রাজার বাড়িতেই তার পরিচয় হয় ঠাকুরঝির সঙ্গে। ঠাকুরঝির সঙ্গে আলাপ ধীরে ধীরে গাঢ় প্রণয়ে পরিণত হয়। একদিকে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে গান গেয়ে কবিয়াল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গর্ব এবং অন্যদিকে ঠাকুরঝির সঙ্গে গভীর প্রণয় তাকে পৌঁছে দিয়েছিল এক স্বপ্নরাজ্যে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঠাকুরঝির আগমন—সেই সময়টিতে কখনও জানালা দিয়ে কখনও বা কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় বসে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে সেই রেললাইনের বাঁকের দিকে, যেখানে ভেসে উঠবে একটি চলমান কাশের রেখা, মাথায় একটি স্বর্ণবিন্দু। তার স্বভাব-ধর্মের সঙ্গে তার শিল্পী প্রাণের কী অদ্ভুত সামঞ্জস্য! টুকরো টুকরো কথাবার্তায়, রহস্যালাপে হাসি-ঠাট্টায়, মান-অভিমানে, গানের কলি রচনায় উপহার দেওয়ার মাধ্যমে প্রণয় যখন গাঢ়তর, তখনই একটা সূক্ষ্ম বিষণ্ণ বেদনা তার মনে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। ঠাকুরঝি পর-স্ত্রী, সে কি তার ঘর ভেঙে দেবে? ঠাকুরঝির সে কি অকল্যাণ কামনা করে? তার এই মানসিক দ্বন্দ্ব তার শিল্পী-স্বভাবকেই প্রকাশ করে। তারপর তার জীবনে নেমে এল সেই চরম রাত্রি যে রাত্রিতে সে ঝুমুরদলের নায়িকা অসুস্থ বসন্তকে নিজের বাসায় সেবা করে এবং নিভৃত আলাপে মত্ত হয়। জানালা দিয়ে এ দৃশ্য ঠাকুরঝি দেখে। এই দৃশ্য ঠাকুরঝির জীবনে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করে—ঠাকুরঝি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যায়। ব্যথাহত জীবন নিয়ে নিতাই গ্রাম পরিত্যাগ করে এবং ঝুমুরদলে যোগ দেয়। সেখানে বসন্তকে ঘিরে তার নতুন জীবন শুরু হয়।

ঝুমুরদলে যোগদান করেও তার মনের দ্বন্দ্ব শেষ হয়ে যায়নি। আসরের প্রথম দিনেই বসন্ত কর্তৃক গালে চড় খাওয়া, মদ পান করা এবং একটা আসুরিক শক্তিকে অনুভব করা, অশ্লীল গানে ভাঁড়ামিতে আসর মাত করে দেওয়া, বসন্তের ঘরে গিয়ে উন্মত্ত রাত্রি যাপন করা—এসব কিছুর জন্যই তার নিজের ওপর তার ঘৃণা জন্মায়, সে দল ছেড়ে পালাবার কথা চিন্তা করে। আবার অন্যদিকে দেহ ব্যবসায়িনী বসন্তের মধ্যে সুপ্ত নারী সত্তার জাগরণ দেখে, অসুস্থ রুগ্ন মেয়েটির মৃত্যু হলে জন্তু জানোয়ারের খাদ্য হবে এই দুঃসহ চিন্তায় এবং গভীর মমত্ববোধে সে বসন্তকে ছেড়ে যেতে পারে না। নিতাইয়ের গভীর মানবতাবোধ ও জীবনবোধকে ঔপন্যাসিক এইভাবে মৃত্যুর বিষণ্ণ পটভূমিকায় সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বসন্তের মৃত্যুর পর নিতাইয়ের উদাসীন পথ-পরিক্রমা শুরু হয়েছে। সে কাশী গমন

করেছে, বিশ্বনাথ দর্শন করেছে, কিন্তু মানসিক তৃপ্তি পায়নি, শেষ পর্যন্ত এক বাঙালি বিধবার কাছে কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছে—তার কাছেই পেয়েছে ঘরে ফেরার নির্দেশ। আসলে ঘরে ফেরার জন্য তার মন উৎসুক হয়েই ছিল। নিজের গ্রাম, মেলা, বন্ধু-বান্ধব, কৃষ্ণচূড়ার গাছ, ঠাকুরঝির স্মৃতি বসন্তের প্রতি তার নিভৃত মনে বারবার ভেসে উঠেছে। অতীত স্মৃতিই তার উদাসী বাউল মনকে স্বগ্রামের দিকে টেনে এনেছে। এই গ্রামের ধুলা মাটির জন্য সে লালায়িত, লালায়িত এই কারণে যে, নানা চরিত্র ও পরিবেশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুটি আবেগঘন অনুষঙ্গ বসন্তের 'কেয়াফুল' এবং ঠাকুরঝির 'কাশফুল'। অশরীরী মানুষের দুটি স্মৃতি। নিতাইয়ের কবি-জীবনে দু'জনেরই সমমূল্য, সমপ্রাধান্য। দু'জনেই তার কবি-জীবনকে প্রেরণা দিয়েছে, সমৃদ্ধ করেছে, আবার দুজনকেই মৃত্যু জনিত বিচ্ছেদ যন্ত্রণা তাকে এক মর্মন্তুদ জীবন-সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে—'জীবন এত ছোটো কেনে'?

নিতাইয়ের চরিত্রের ছোটোখাটো দু'একটি অসঙ্গতি আমাদের চোখে ধরা পড়ে। নিতাই যেভাবে তার পারিবারিক আবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে এসেছে, যেভাবে প্রবল নীতিবোধের দ্বারা চালিত হয়েছে তাতে সে সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্র হিসেবেই আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে সে একসময়ে বলেছে "আজ্ঞে হুজুর, মিছে কথা আমি বলি না...এই মা চণ্ডীর সামনে দাঁড়িয়ে আমি বলছি মিছে বলি তো বজ্রাঘাত হবে আমার মাথায়।" অথচ এই নিতাই দূরে এক কবি গানের বায়না পেয়ে নিজ পয়সায় জুতো ও চাদর কিনে এনে অম্লানবদনে বলেছিল যে চাদরখানা সে বাবুদের কাছ থেকে শিরোপা হিসেবে পেয়েছে। এমনকি এই মিথ্যে কথা সে ঠাকুরঝির কাছেও বলেছে। কেন অকারণে তার এই মিথ্যা বলা? অবশ্য সকলের কাছে থেকে মহিমা ও সম্ভ্রম আদায় করার একটা প্রচেষ্টা তার থাকতে পারে, কিন্তু সেই প্রচেষ্টারও একটা ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন ছিল। তা না হলে নিতাইয়ের প্রতিজ্ঞাজনিত কারণে পাঠকের মনে একটা আঘাত লাগে।

নিতাইয়ের আর একটি পতন বা স্খলন পাঠকের মনকে আঘাত দেয়। অতি বাল্যকাল থেকে রুচি ও শালীনতাবোধের যে কঠিন বর্মের দ্বারা সে নিজেকে আবৃত করে রেখেছিল সেই বর্ম খসে যায় ঝুমুরদলে গান গাইতে গিয়ে। তার রুচিসম্মত ও শালীনতাপূর্ণ গান দর্শকদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি বারবার দাবি আসে অশ্লীল ও ভাঁড়ামিতে ভরা গানের জন্য, কিন্তু নিতাই রাজি হয়নি। পরিণামে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয় বিপক্ষদলের কাছে। এই পরাজয় বসন্ত মেনে নিতে পারেনি, সে রাগে ক্ষোভে নিতাইয়ের গালে চড় মারে। এই চড় খাওয়ার পর নিতাইয়ের চরিত্র হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে জীবনে প্রথম মদ খায়, সে শরীরে বীরবংশী রক্তের আদিমতা অনুভব করে, অশ্লীল গানে, ভাঁড়ামিতে আসর মাত করে দেয়, দুর্বার বর্বর শক্তির আবেগে বসন্তকে জড়িয়ে ধরে, তার ঘরে রাত কাটায়। যে পশুশক্তিকে চাপা দেবার জন্য তার আজীবন সাধনা, শেষ পর্যন্ত সেই পশুশক্তিরই কাছে তার পরাজয় ঘটল। নিতাইয়ের এই পরিবর্তন পাঠক সহজ মনে গ্রহণ করতে পারে না। তার নৈতিক চরিত্রের এই অধঃপতনের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি আরও বিশদভাবে ফুটিয়ে তোলা উচিত ছিল।

এই ধরনের দু'একটি ত্রুটি পরিহার করলে আমরা দেখি, নিতাই যেভাবে তার পারিবারিক প্রতিবেশ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে, যেভাবে নিজেকে কবিয়াল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দুর্মর সাধনায় রত হয়েছে তাতে তার দৃঢ় মানসিকতা, মনুষ্যত্ববোধ ও আত্মমর্যাদাবোধেরই প্রকাশ ঘটেছে। সর্বোপরি তার প্রেমিকসত্তা কখনও ঠাকুরঝিকে নিয়ে প্রেমের স্বর্গ রচনা করেছে, কখনও বা বসন্তের মতো স্বৈরিণী নারীর অধঃপতিত আত্মাকে পঙ্কিল জীবনের শেষ সীমা থেকে তুলে এনে প্রেমের ঝরণাধারায় চান করিয়েছে। বসন্তের মৃত্যু তার মনকে উদাসী বাউল করেছে, আর স্বগ্রামে ফিরে এসে সে যখন ঠাকুরঝির মৃত্যু-সংবাদ শুনেছে, তখন তার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে। তার এই চোখের জল, আসলে যে তার প্রেমিক সত্তার-ই রক্তক্ষরণ তা বুঝে নিতে পাঠকের বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।

● **ঠাকুরঝি ঃ**

যে দুটি নারী চরিত্র নিতাইয়ের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে তার একটি হল ঠাকুরঝি। এই ঠাকুরঝির সঙ্গেই তার জীবনের প্রথম প্রেম। এই ঠাকুরঝিই তার কবি গানের প্রেরণা। তারাশঙ্কর তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে বলেছেন সে এই ঠাকুরঝি চরিত্রটিও তার চোখে দেখা বাস্তব চরিত্র। তিনি লিখেছেন—

"ঠাকুরঝির অস্তিত্ব আছে। সে গ্রামান্তরের রুইদাস বংশের মেয়ে, ছোটোখাটো চিরকিশোরীর মতো গঠন, চোখে ভীরু চঞ্চল হরিণীর দৃষ্টি, তাঁতে বোনা খাটো কাপড় খানি আঁট সাঁট করে বেঁধে মাথায় দুধের ঘটি নিয়ে এ গ্রামে দুধের জোগান দিতে আসত। আসত ওই রেল লাইন ধরে, সে দিত বেনে মামার দোকানে দুধের জোগান। সতীশও (উপন্যাসে নিতাই) তার কাছে এক পোয়া হিসেবে দুধ নিত। খুব দ্রুত কথা বলত, সে সবের পিছনে যেন একটি সরল শঙ্কাত্রস্ততা ছিল।... এমনি সে মেয়েটি। মধ্যে মধ্যে সতীশ তার সঙ্গে রহস্যালাপ করত, সে আমি শুনেছি অন্তরাল থেকে। আমি স্টেশনে গিয়েছি দুপুরবেলা, চা খাব বলে—মামার দোকানে, কিন্তু দুধ নেই, ফুরিয়েছে বেনে-মামা স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্লাটফর্মের ওপর, সতীশ এগিয়ে শান্টিং পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে; দৃষ্টি রোদ ঝকঝকে লাইনের ওপর, লাইনটা আধ মাইলটাকে গিয়ে একেবারে পূর্ব থেকে দক্ষিণ দিকে মোড় ফিরে বেঁকে গেছে; যেখানটায় দুটো লাইন মিলে গিয়েছে একটি বিন্দুতে, সেইখানে সকলের দৃষ্টি। হঠাৎ সেই বিন্দুর উপর থেকে রৌদ্র প্রতিফলিত দুধের ঘটির ছটা সকলের চোখে পড়তো। ছটা বিন্দুটি চঞ্চল চলমান, তার নীচে দেখা যেত ক্ষারে কাচা কাপড়ে আবৃত ক্ষীণ তনু মহিমা। মনে হত স্বর্ণশীর্ষবিন্দু কাশফুল একটি। ঠাকুরঝি ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠত। শান্টিং পয়েন্টের ধারেই একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছও আছে, তার গোড়াটি, বাঁধানো চারপাশে তার জয়ন্তী কস্তুরী ফুলের জঙ্গল, আমি সেইখানে বসে কী শুয়ে থাকতাম, সেখান থেকেই শুনতে পেতাম, সতীশ তার সঙ্গে রসিকতা করছে।"

স্পষ্টতই বোঝা যায় চোখে দেখা বাস্তব চরিত্রের ওপর কল্পনার রং মিশিয়ে তারাশঙ্কর এই ঠাকুরঝি চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু চরিত্রটি পূর্ণ বিকশিত হওয়ার আগেই ঔপন্যাসিক

নির্মমভাবে মধ্যপথে তাকে অপসারিত করেছেন। অথচ পনেরো-ষোলো বছরের এই কিশোরী মেয়েটির রূপ সৌন্দর্য বর্ণনায় লেখকের কী সযত্ন প্রয়াস "দীঘল দেহ ভঙ্গিতে ভুঁইচাঁপার সবুজ সরল ডাঁটার মতো একটি অপরূপ শ্রী।' 'অথবা' 'তাহার সর্বাঙ্গে কচিপাতার মতো যে একটি কোমল ঘনশ্যাম শ্রী আছে"...। বন্ধু রাজনের বাড়িতে নিতাই ও ঠাকুরঝির প্রথম আলাপ, তারপর ঘনিষ্ঠতা ও প্রেম। কবিগানের আসরে নিতাইয়ের উপস্থিত জবাব, সুমধুর কণ্ঠস্বর, ঠাকুরঝির মনে একটা বিস্ময় ও মুগ্ধতা সৃষ্টি করে। মুগ্ধতা বা তন্ময়তা এতটাই যে "ঠাকুরঝির অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে দেহের বেশবাসও অসম্বৃত।" এটা তার প্রেমের প্রথম ধাপ। এরপর দুধ দেওয়ার সূত্রে প্রতিদিনের সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে এই প্রেম ক্রমপরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। যেদিন রাজেন তার শালীকে 'কালো আলকাতরার মতো রং' বলে ঠাট্টা করেছে সেদিন সদাহাস্যময়ী মেয়েটি বেদনায় স্তব্ধ হয়েছে। মেয়েটির মন থেকে দুঃখ যন্ত্রণা মুছে দেবার জন্য নিতাই গান গেয়ে উঠেছে—'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁন্দ কেন'! প্রেমাস্পদের এই গান তার মনের মলিনতাকে এক মুহূর্তে মুছিয়ে দিয়েছে। তারপর নিতাইয়ের সঙ্গে চা খেতে খেতে কথা বলতে বলতে একসময় ঠাকুরঝির মাথার কাপড় খসে গেছে, তার রুক্ষ মাথায় এক থোকা টকটকে রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল দেখে নিতাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ঠাকুরঝি ক্ষিপ্র হাতে মাথায় ঘোমটা টেনে দিতে গেলে নিতাই তার হাত ধরে ফেলেছে। নিতাইয়ের হাতের সংস্পর্শে ঠাকুরঝি লজ্জা পেয়েছে, কিন্তু এই লজ্জার মধ্যেও একটা অপরিসীম আনন্দও তার মনকে ভরিয়ে দিয়েছে। আর্থিক দৈন্যের জন্যে নিতাই যখন দুধ কেনবার অক্ষমতা প্রকাশ করেছে বাণবিদ্ধ হরিণীর মতো ঠাকুরঝি অস্থির চঞ্চল হয়েছে, প্রবল-আবেগে নিতাইয়ের হাত দুটি জড়িয়ে ধরে তার কাছে বিনা পয়সায় দুধ নেবার জন্য অনুরোধ করেছে। প্রেমের সুমধুর বিচিত্র প্রকাশ ঘটছে এইভাবে। প্রেমের পরিণত রূপ দেখি যখন ঠাকুরজি নিতাইয়ের উপহার দেওয়া হার গলায় পরে স্রোতস্বিনীর ধারে দাঁড়িয়ে জলের ওপর নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করেছে।

কিন্তু তারপরই এই পবিত্র ভীরু, নিষ্কলুষ প্রেমের ওপর নিদারুণ অভিশাপ নেমে এল। নিজের বাসায় গভীর রাত্রিতে ঝুমুরদলের নায়িকা বসন্তকে নিয়ে নিতাইয়ের বিশ্রম্ভালাপ ও গান গাওয়া এবং জানালা দিয়ে ঠাকুরঝির সেই দৃশ্য দেখা তার জীবনে গভীর সংকটের সৃষ্টি করল। তিলে তিলে যে প্রেমের স্বর্গ সে রচনা করেছিল এক মুহূর্তেই তা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। ফুলের মতো নরম, পেলব হৃদয় এই কঠিন আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। প্রেম তার হৃদয়ের গভীর তলদেশে বাসা বেঁধেছিল বলেই প্রেমাস্পদের কাছ থেকে পাওয়া এই মর্মন্তুদ আঘাতে সমগ্র জীবন ও জগৎ তার কাছে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। দুঃসহ যন্ত্রণায় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় অকালমৃত্যু বরণ করে সে এই প্রেমের চরম মূল্য দিল।

এই চরিত্র পরিকল্পনায় সামান্য একটু ত্রুটি ধরা পড়ে। সেটি হল সময়জ্ঞান বা সম্ভাব্যতার ত্রুটি। স্টেশনের ধারে ঝুমুরদলের আসর থেকে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে এসে নিতাইয়ের বাসার জানালা দিয়ে উঁকি মারা এবং নিতাই ও বসন্তের অন্তরঙ্গ আলাপের দৃশ্য দেখে অভিমানী ঠাকুরঝির মধ্যরাত্রে একাকী মাঠের ওপর দিয়ে দূর গাঁয়ে ফিরে যাওয়া এসব

সম্ভব কিনা, এ প্রশ্ন পাঠকের মনের মধ্যে জাগা খুব স্বাভাবিক। বিশেষ করে নিতাইয়ের বাসার চতুর্দিকে যখন নারীলোভী কাদের শেখের ছেলে নয়ান ও তার দলবল ঘুরছিল। সময়টার একটু অদল বদল করে দিলেই এই ত্রুটি এড়ানো যেত। তাছাড়া আর একটি ব্যাপারও পাঠকের মনকে অপরিতৃপ্ত করে। সেটি হল ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়ির কোনো পূর্ণ চিত্র উপন্যাসে অঙ্কিত হয়নি। শ্বশুড়বাড়ির লোকেদের বিশেষ করে স্বামীর প্রসঙ্গ একটু উদ্‌ঘাটিত হলে হয়তো তার চরিত্রটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারত।

● **বসন্ত ঃ**

তারাশঙ্কর যে ঝুমুরদলের কথা 'কবি' উপন্যাসে বলেছেন, সেই দলের মধ্যে সব চেয়ে আকর্ষণীয় ও করুণ চরিত্র হল বসন্তের চরিত্র। এই নারী অপরূপ দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। সে দীর্ঘ কৃশতনু এবং গৌরঙ্গী। অদ্ভুত তার চোখ দুটি। বড়ো বড়ো চোখ দুটির সাদা ক্ষেত্রে যেন ছুরির ধার। সেই শাণিত দীপ্তির মধ্যে কালো তারা দুটি কৌতুকে সর্বদাই চঞ্চল—যেন মরণজয়ী দুটি কালো ভ্রমর। সে যখন হাসে তখন সে খিলখিল করে হাসে—সেই হাসির আবেগে তার দীর্ঘ কৃশতনু থরথর করে কাঁপে, মন হয় সর্বাঙ্গ দিয়ে সে হাসে। সে হাসির ধারে মানুষের মন কেটে টুকরো টুকরো হয়ে ধুলোয় লুটোয়। সে ঝুমুরদলের কেন্দ্রমণি শুধু অপরূপ দেহ সৌন্দর্যের জন্যে নয়, নাচে গানে তার দক্ষতাও অপরিসীম। আসরে যখন সে নাচে তখন তার দ্রুত বেগবান উন্মত্ত নাচে দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে যায়। এই জন্যেই দলের মধ্যে তার একটা আলাদা মর্যাদা আছে—এই জন্যেই দলনেত্রী প্রৌঢ়া মাসির সে একান্ত প্রিয়।

কিন্তু মনের দিক থেকে এই নারীটি নিসঙ্গ। ঝুমুরদলের প্রত্যেকটি মেয়ের একটি করে মনের মানুষ আছে এমনকি প্রৌঢ়া মাসিরও। কিন্তু বসন্তের নেই। তার স্বভাবের উগ্রতা, তার চরিত্রের খরদীপ্তিতে কেউ তার পাশে ঘেঁষতে পারেনি। মনে হয়, সে ক্ষয়রোগগ্রস্তা বলে সে নিজ জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ, যে জীবনকে সে পেয়েছে তাকে দুমড়ে মুচড়ে খাক করে দিতে চায় সে। এই আত্মদহনের নির্মম জ্বালার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও মর্মান্তিক রসিকতার মাধ্যমে। অসুস্থ অবস্থায় ঠান্ডা মেঝের ওপর শুয়ে পড়েছে দেখে নিতাই তাকে কিছু পেতে দিতে চাইলে সে ব্যঙ্গ মিশ্রিত সুরে বলেছিল 'ওলো নাগর আমার পীরিতে পড়েছে। দরদ একেবারে গলায় গলায়।' মাসি যখন নিতাইকে প্রেমাস্পদ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য বসন্তকে বলেছিল তখন নিজের দেহ বর্ণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গর্বিতা এই নারী পরিহাসের সুরে বলেছিল "মা গো! ও যে বড্ড কালো...কালো অঙ্গোর পরশ লেগে আমি সুদ্ধু কালো হয়ে যাব মাসি।" তার ক্ষুরধার কথাবার্তা তার নির্মম রসিকতা যে-কোনো মানুষকে বিদ্ধ করে দেয়, ফলে তার মনের মানুষ জোটেনি।

এ হেন নারীরও ধীরে ধীরে হৃদয় পরিবর্তন ঘটল কবিয়াল নিতাই চরণের নিবিড় সাহচর্যে। প্রথমদিকে অবশ্য নিতাই যোগ্য প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে এই নারীটির মনে কিছু ধাক্কা দিতে চেয়েছে, চেতনার সঞ্চার করতে চেয়েছে। মাছ কেনার জন্যে চারপয়সা দিতে গেলে নিতাই তাকে আলগোছে দিতে বলেছে। কারণ জানতে চাইলে নিতাই বলেছে—

"কয়লার ময়লা লাগবে ভাই তোমার রাঙা হাতে।" নিজের রূপ গর্বে গর্বিতা অহঙ্কারিনি এই নারীকে কিঞ্চিৎ আঘাত দেবার জন্যে বলেছে 'আহা—রাঙা বরণ শিমুল ফুলের বাহার শুধু সার।' কিন্তু আলেপুরের মেলায় এসে এই দুটি চরিত্র পরস্পরের কাছাকাছি এল নিতাই তার মনে ঠাকুরঝির শূন্য আসনে বসন্তকে প্রতিষ্ঠা করল। ঠাকুরঝি বিহনে যে গানের উৎসমুখ শুকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল বসন্তের সান্নিধ্যে তা আবার ভরে উঠল। বসন্তের কাছেও 'কয়লা-মানিক' 'কালো-মানিকে' রূপান্তরিত হয়ে গেল। তার দুঃখক্ষত হৃদয়-মরুভূমিতে নিতাই যেন শান্ত শীতল মরুদ্যানের মতো। আকণ্ঠ জীবন-পিপাসা নিয়ে নিতাইকে আঁকড়ে ধরে নারী জীবনের গোপন বাসনাকে সে চরিতার্থ করতে চাইল। গালে চড় মেরে সে নিতাইয়ের নির্জীব পৌরুষ শক্তিকে জাগ্রত করল, অপমানের জ্বালায় মদ খেয়ে নিতাই তার শিরায় শিরায় পূর্ব-পুরুষদের আদিম বর্বর শক্তিকে অনুভব করল, রূঢ়তম পৌরুষের বলিষ্ঠ রূপ নিয়ে নিতাই এগিয়ে এলে তার বাহু বন্ধনের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করে গভীর আবেগে সে চুম্বনে চুম্বনে তাকে মাতিয়ে তুলল।

বসন্ত নিম্নস্তরের দেহ ব্যবসায়িনী। মেলায় মেলায় দেহের বেসাতি সে করে বেড়ায়। এটা তাদের রীতি, তাদের ধর্ম। মদ্যপান তাদের জীবনের অঙ্গ। সেই সূত্রে কত নাগর এসেছে তার জীবনে, কত উন্মত্ত রাত্রি কেটেছে বীভৎস উল্লাসে। কত নিশাচর প্রাণী তার দেহকে দলিত মথিত করেছে এবং ভোগস্পৃহা শান্ত হলে বাসি ফুলের মতো তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। কেউ তার মনে কোনও দাগ কাটেনি। তার এই পঙ্কিল কর্দমাক্ত জীবনে অবশেষে প্রেমের পদ্ম ফুটে উঠল। ফুটে উঠল নিতাইকে অবলম্বন করেই। তাই একদিন সে মাসিকে উদ্ধত ভঙ্গিতে বলেছিল 'মরে গেলে ফেলে দিও'—সেই আজকে আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনে মর্মন্তুদ হাহাকারে বলে উঠেছে 'জীবন এত ছোটো কেনে'। যে নিতাইকে নিয়ে তার সুখ-স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল নীড় বাঁধার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল—নির্মম কালব্যাধি এসে সেই স্বপ্নকে, সেই আকাঙ্ক্ষাকে ধুলিস্যাৎ করে দিল। তাই ব্যর্থতার করুণ রাগিনীর সুর ফুটে উঠেছে তার ব্যথাদীর্ণ কথায় "মরতে আমার ভয় ছিল না, কিন্তু আর যে মরতে মন চাইছে না।" ভাগ্যের নির্মম—অভিশাপে তার জীবনতৃষ্ণা অচরিতার্থই থেকে গেল। স্বামী-পুত্র ঘর-সংসারের স্বপ্ন দেখেছিল সে, কিন্তু অকালমৃত্যু তার স্বপ্নকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিল। এক দুরন্ত অভিমান নিয়ে সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল।

পতিতা নারীর হৃদয়-যন্ত্রণার কথা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন—সুনিপুণভাবে। কিন্তু তারাশঙ্কর 'কবি' উপন্যাসে যেভাবে বসন্ত নামক এই স্বৈরিণী, নারীটির মর্মন্তুদ জীবন-যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে তাঁর অপরিসীম কৃতিত্বের কথা স্বীকার করতেই হবে। নিজের আগুনে নিজেই জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া এই নারী প্রেমের শান্ত শীতল সরোবরে অবগাহন করে নিজের দেহ-মনকে শান্ত করেছিল—নতুন করে বেঁচে উঠতে চেয়েছিল আপন প্রেমাস্পদকে অবলম্বন করেই। পতিতা নারীর এই প্রেমের মধ্যে কোনও খাদ ছিল না, কোনও ভণ্ডামী ছিল না। তাই তার সকাতর উক্তি 'জীবন এত ছোটো কেনে'—প্রমাণ করে দেয় প্রেমের পবিত্র স্পর্শেই দীর্ঘায়ু জীবনের কামনা করেছিল সে। জীবনের পঙ্ক থেকে প্রেমের পঙ্কজ ফুটিয়ে তুলেছেন তারাশঙ্কর এই নারী চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই।

'কবি' উপন্যাসে গান

সংগীত Abstract বস্তু—সে আমাদের ভাবের জগতে মুক্তি দেয়, আমাদের জাগতিক জ্বালা-যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে দিতে সাহায্য করে, আমাদের আবেগ অনুভূতিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করে। উপন্যাস মানব জীবনেরই রসরূপ—সেই রসরূপকে ফুটিয়ে তুলতে গানের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

নানা কারণে ঔপন্যাসিক উপন্যাসে সংগীত যোজনা করে থাকেন। প্রথমত, উপন্যাসে বর্ণিত অনেক চরিত্রের তাৎপর্য সংগীতের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, সংগীতের সাহায্যে কোনো চরম পরিস্থিতি বা ঘটনাকে ব্যক্ত করা সহজসাধ্য হয়। তৃতীয়ত উপন্যাসের অনেক ঘটনাবলি যার উপস্থাপনা উপন্যাসে হয়তো নেই, ঔপন্যাসিক সংগীতের মধ্য দিয়ে সেই অদৃশ্য ঘটনাবলি জানিয়ে দেন অথবা পূর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে সংগীতের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন। চতুর্থত, পাত্র-পাত্রীর মানসিক দ্বন্দ্ব, তাদের আবেগ উচ্ছ্বাস, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি অনুভূতিগুলি গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় সার্থকভাবে।

ব্যক্তি জীবনে তারাশঙ্কর ছিলেন সংগীতের একান্ত ভক্ত। সংগীত রচনায় তার যে কতখানি দক্ষতা ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তার বিভিন্ন উপন্যাসে, বিশেষ করে 'কবি' এবং 'মঞ্জরী অপেরা'-তে। তাঁর 'কবি' উপন্যাসে স্বভাব কবি নিতাইয়ের জীবনালেখ্য চিত্রিত হয়েছে। ফলে উপন্যাসটি সংগীত-প্রধান উপন্যাস হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। নিতাইয়ের আজীবন স্বপ্ন ছিল বড়ো কবিয়াল হওয়ার। তাই আশ-পাশের গ্রামে কোনও কবিগান, মেলা বা যাত্রার সংবাদ পেলেই সে চলে যেত বন্ধু রাজনকে সঙ্গে নিয়ে। সেখানে আলোকোজ্জ্বল আসরের মাঝখানে একাগ্রচিত্তে, মুগ্ধভাবে বসে সে গান শুনত। এ রকম উৎসব মুখর রাত্রির মধ্যে দিয়ে তার সমস্ত জীবনটাকে কাটিয়ে দেবার একটা বাসনা তার মনের মধ্যে জাগত। মনের এই বাসনাকে সে বারবার গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছে। নির্জন প্রান্তর পেলেই সে গান গাইত, গান গেয়ে সে শোনাত নিজেকেই, কখনও শোনাত কোনও অদৃশ্য রসময় ভাইকে—

সেই মেলাতে কবে যাব
ঠিকানা কি হায়রে
যে মেলাতে গান থামেনা
রাতের আঁধার নাইরে।
ও রসময় ভাই রে।

অন্তরের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে বুকের মধ্যে বহন করে নিয়ে সে বেড়াত, আর সেই আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করত গানের মধ্যে। সাধারণ কথা বা সংলাপের মধ্যে নয়, তার সুখ দুঃখ আনন্দ অনুভূতি, আবেগ আকাঙ্ক্ষার বাহন হয়েছে গান।

তার কবি হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ আসে চণ্ডীমণ্ডপে কবি-গানের মধ্য দিয়ে। প্রসিদ্ধ কবিয়াল নোটন দাসের অনুপস্থিতিতে সে আসরে গান গাওয়ার এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ পায়। জীবনের এই প্রথম কবি-গানেই সে শ্রোতাদের মন জয়

করে ফেলে তার সমধুর কণ্ঠের সাহায্যে। সকলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত হয় রাজন, মুগ্ধ বিস্মিত হয় ঠাকুরঝি। কিন্তু তার এই বিজয় গৌরবে আঘাত আসে অন্য এক দিক দিয়ে। চণ্ডীমায়ের প্রসাদী সিন্দুর মাখানো শুকনো বেল-পাতার মালা গলায় দিয়ে যখন সে দিগ্বিজয়ী কবিদের মতো মনের উল্লাসে বাসায় ফিরছিল তখন পথের মধ্যে তাকে আটকায় তার মামা। মামা ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী ডাকাতদের নৈশ অভিযানের কুলাধিপতি। এই খুন, জখম ডাকাতির পরিবেশ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল নিতাই, আশ্রয় নিয়েছিল রেলওয়ে কোয়ার্টারে, রাজনের কাছে। তখন থেকেই সে এক নতুন পথের অভিযাত্রী সে পথ কবি গানের পথ। সেই সূত্রেই চণ্ডীমণ্ডপে গানের আসরে তার প্রথম আবির্ভাব। এই আসরে বিপক্ষ দলের কবিয়াল তাঁর কলঙ্কিত বংশের কথা টেনে এনে নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তাকে জর্জরিত করে। এতে নিতাই ক্রুদ্ধ না হলেও তার মামার পৌরুষে আঘাত করে। মামার সমস্ত ক্রোধের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় নিতাই—কারণ তার জন্যই এই অপমান, তার জন্যই পূর্বপুরুষদের এত অমর্যাদা। তাই পথের মাঝখানেই মামার আক্রমণ, ক্রুদ্ধ হুংকার ও শারীরিক নির্যাতন। কিছুক্ষণ আগেও যে ছিল স্বপ্ন জগতের বাসিন্দা, অসংখ্য মানুষের প্রশংসায় আপ্লুত-হৃদয়,—সে মুহূর্তেই আছড়ে পড়ল বাস্তবের কঠিন মাটিতে। আর তখনই তার হৃদয় থেকে উৎসারিত হল গভীর বেদনার বাণী—

আমি ভালবেসে এই বুঝেছি সুখের সার সে
চোখের জলে রে
তুমি হাস আমি কাঁদি, বাঁশি বাজুক কদমতলে রে।

স্বপ্ন আর বাস্তবের দ্বন্দ্ব চলে আসছে সেই আদিম যুগ থেকে। আর এই দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয় কোমল প্রাণ। তখন সেই বিদীর্ণ হৃদয়ের গোপন ব্যথা ঝরে পড়ে গানের করুণ সুরে। নিতাইয়ের গানটি তাই বিষণ্ণ বেদনায় ভরা।

এর পরের গানগুলি উৎসারিত হয়েছে ঠাকুরঝিকে কেন্দ্র করে। ঠাকুরঝি তার কাছে শুধু একজন প্রেমিকা নয়, সে তার গানের প্রেরণাদায়িকা শক্তি। এই ঠাকুরঝির সংস্পর্শেই তার কবিমন শতদল পাপড়ির মতো বিকাশ লাভ করেছে। ঠাকুরঝিই তার কবিত্বের গাঙে জোয়ার এনেছে। বর্ষা সমাগমে শুষ্ক তরু যেমন মঞ্জরিত হয়ে ওঠে তেমনি ঠাকুরঝির নিবিড় সান্নিধ্যে তার মন হয়ে উঠেছে উল্লসিত। পল্লবিত সরস কাঁচা বাঁশের মতো তার দীঘল দেহের আকর্ষণে মুগ্ধ হয়েছে নিতাইয়ের মন। তাঁর কালো কোমল শ্রীর মাধুর্য তার মনকে আবিষ্ট করে রাখে। কিন্তু রাজন একদিন তার কালো রঙটিকে নিয়েই কটু কথা বলে। আলকাতরার মতো রং বলে তাকে বিদ্রূপ করে। ফলে সতত হাস্যমুখী ঠাকুরঝি একমুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়। নতমুখে এক নীরব বেদনা নিয়ে দ্রুত সে স্থান পরিত্যাগ করে। কিন্তু তার এই বেদনা আঘাত করে নিতাইয়ের মনকে। বিষণ্ণ হৃদয়ে আত্মমগ্ন হয়ে সে চিন্তা করে কালো কি মন্দ? কৃষ্ণের গাত্রবর্ণও তো কালো, কোকিলও কালো, চুলও কালো। তাহলে তারা কি মন্দ? কালোর কি মাহাত্ম্য নেই? নেই কোনও সৌন্দর্য! তখনই তাঁর মনে জেগে ওঠে গানের একটি কলি—

কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেন?

অস্থির উন্মনা মন নিয়ে সে এসে দাঁড়ায় কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। দেখে দ্রুতগমনে ফিরে যাচ্ছে ঠাকুরঝি। তার অভিমান ভাঙ্গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে আসে তার বাসায়। অন্তরঙ্গ আলাপে মত্ত হয় দুটি তরুণ-তরুণী। হঠাৎ মাথার অবগুণ্ঠন খসে যায় ঠাকুরঝির, দেখা যায় তার রুক্ষ কালো চুলের এলো খোঁপায় এক থোকা টকটকে রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল। লজ্জায় সে সচকিতা হরিণীর মতো তার খসে পড়া ঘোমটাটিকে যখন ক্ষিপ্র হাতে দ্রুত ভঙ্গিতে মাথায় তুলে দিতে গেল তখন আত্মবিস্মৃত নিতাই অকস্মাৎ তার হাত চেপে ধরে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আত্মসম্বিৎ ফিরে পায় নিতাই, সে হাত ছেড়ে দেয়। ঠাকুরঝি চলে যায়, কিন্তু বারবার ফিরে ফিরে তাকায়। তখন সলজ্জ হাসিতে পরিপূর্ণ তাঁর গালে। মুখখানি রৌদ্র ছটায় কচি পাতার মতো ঝলমল করে ওঠে। দূর থেকে নিতাই দেখে তার কালো চুলে লাল কৃষ্ণচূড়া আকাশের তারার মতো জ্বল জ্বল করছে—আর তখনই তার মনে জেগে ওঠে গানের দ্বিতীয় কলিটি—

কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছে কি নয়নে?

এইভাবে ঠাকুরঝি নিতাইয়ের মনে জাগিয়ে তুলছে তার বিকাশোন্মুখ কবি-সত্তাকে, স্নিগ্ধ শিশিরের স্পর্শ যেমন করে জাগিয়ে তোলে ফুলের কুঁড়িকে।

প্রেম যখন ধীরে ধীরে নিতাইয়ের মনকে অধিকার করেছে তখন সেই প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে তার গানের মধ্য দিয়ে। কবিগানের আসরে যে গানটি সে গেয়েছে সেটি আসলে তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অন্তর মথিত বেদনার গান। ব্যক্তি হৃদয়ের উষ্ম আবেগ থাকার জন্যই গানটি হয়েছে জীবন্ত মর্মস্পর্শী—

তোমার বুকের আগুন যেন আমার বুকে পিদীম জ্বালে রে!

ঠাকুরঝির প্রেমের স্নিগ্ধ কিরণ কীভাবে নিতাইয়ের বুকে প্রেমের প্রদীপটি জ্বালিয়ে দিয়েছে—তারই আভাস ও ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে গানটির মধ্যে।

পরের গানটির মধ্যে নিতাই তার নিজের মনের মুখোমুখি হয়েছে। কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সে প্রতিদিন তাকিয়ে থাকে দূরে রেললাইনের বাঁকের দিকে—যেখানে ভেসে ওঠে একটি স্বর্ণবিন্দু শীর্ষ—একটি দ্রুত চলমান কাশফুল—ছবিটি ঠাকুরঝির। কিন্তু কেন সে দাঁড়িয়ে থাকে ঠাকুরঝির জন্য—সে তার কে? এর উত্তর এসেছে তার মনের ভেতর থেকে, ঠাকুরঝি তার 'মনের মানুষ'। মনের মানুষের জন্যই সে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে, তার ইচ্ছা হয় পথের ধারেই ঘর বেঁধে বাস করে। মনের আনন্দে হৃদয় তরঙ্গের দোলায় সে গান রচনা করে—

ও আমার মনের মানুষ গো
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর
ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা
আমায় হেথা টানে নিরন্তর।

সে বুঝেছে ঠাকুরঝিকে সে ভালোবাসে। আর এই ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে সে দুটি রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল তুলে দেয় ঠাকুরঝির হাতে। লজ্জিতা ঠাকুরঝি ক্ষিপ্র হাতে ফুল

দুটে নিয়ে পালায়। আর নিতাইয়ের মনে গান জেগে ওঠে। মনের আনন্দে সে গায়—

ও আমার মনের মানুষ গো
ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা
সেই ছটাতে—ঘর পুড়িল পথ করিলাম সার

নিতাইয়ের চোখের সামনে নতুন এক ভুবন গড়ে ওঠে, সেই ভুবনে অবিরাম প্রেমের বাঁশি বেজে চলেছে। পার্থিব জীবনের দুঃখ-কষ্ট সেই বংশীধ্বনির নীচে চাপা পড়ে যায়। আনন্দিত নিতাই সেই চির পুরাতন সুরে প্রশ্ন তোলে—

চারদিকে চার বৃন্দাবনে বংশী বাজে কার—

এই বংশীধ্বনি চিরকাল ধরে বেজে চলেছে যার হৃদয় প্রেম জাগ্রত হয়, সেই কেবল শুনতে পায় অন্যেরা পায়না। কিন্তু প্রেমের এই অনাস্বাদিত আনন্দ ধরে রাখা যায় না। এই সুখও যেন আতান্তর হয়ে ওঠে—

ঘর জ্বলিল মন হারালো ছটার সুরে গো সুখের একি আকুল আতান্তর

কিন্তু প্রেমের এই পরিপূর্ণতার মাঝখানেই একটা দ্বিধা ও সংকোচের কাঁটা নিতাইয়ের মনকে খোঁচা দিতে থাকে। ঠাকুরঝি বিবাহিতা, পরস্ত্রী, পরস্ত্রীকে ভালোবাসা মহাপাপ, কিন্তু মন যে মানতে চায় না, অবাধ মন যে কোনও শাসন মানে না, চোখ বুজলেই তার সামনে ভেসে ওঠে ঠাকুরঝির মুখ। মনে তার নিত্য যাওয়া আসা। পাপ হয় হোক্ ঠাকুরঝির জন্য সে নরকে যেতেও রাজি। কলঙ্ক হয় হোক্ তবু ঠাকুরঝিকে সে ভুলতে পারবে না। মনের মধ্যে জেগে উঠল নষ্ট চাঁদের কথা—

চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে বলে কে দেখে না চাঁদ / তার চেয়ে চোখ যাওয়াই ভালো ঘুচুক আমার দেখার সাধ / ওগো চাঁদ তোমার লাগি—না হয় আমি বৈরাগী / পথ চলিব রাত্রি জাগি, সাধবে না কেউ আর তো বাদ।

কৃষ্ণচূড়া গাছের তলা থেকে সে যাত্রা শুরু করল সেই পথে—যে পথে ঠাকুরঝি রোজ দুধ নিয়ে আসে। ঠাকুরঝির উদ্দেশ্যে গান গাইতে, সে চলল তার শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে। কিন্তু যাত্রাপথে নদী অতিক্রম করতে গিয়ে নদীর জলে পা পড়তেই সে চমকে উঠল। সে একি করছে? ঠাকুরঝির শ্বশুড়বাড়িতে গেলে তার স্বামী ননদ শাশুড়ী কী বলবে? পাড়া প্রতিবেশীরা কী ভাববে? দিশেহারা ঠাকুরঝি সকলের গঞ্জনার মধ্যে পড়ে কী করবে? তখন ঠাকুরঝি নিন্দায় ঘর পাড়া গ্রাম ভরে উঠবে। লোক ঠাকুরঝিকে দেখিয়ে কুৎসিত, অভদ্র কথা বলবে? সকলেই আঙ্গুল তুলে তাকে 'কালামুখী' বলে সম্বোধন করবে। তাকে নিয়ে দেশান্তরী হয়ে গেলে লোকে 'কলঙ্কী' বলে অভিহিত করবে। মনের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়ে সে নদীর ঘাটে বসে পড়ল। আপন মনেই ভাবল ঠাকুরঝি তার কাছে আকাশের চাঁদ। আকাশের চাঁদ আকাশেই থাকুক—সে শুধু দূর থেকে তাকে দেখে মনের সাধ পূর্ণ করবে—

চাঁদ তুমি আকাশে থাক—আমি তোমায় দেখব খালি
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে—সোনার অঙ্গো লাগবে কালি।

নিতাই বাসায় ফিরে এল এবং সমস্ত রাত্রি সে যুদ্ধ করল নিজের মনের সঙ্গে।

না সে ঠাকুরঝির সুখের সংসার ভেঙ্গে দিতে পারবে না। সে এবার ঠাকুরঝির কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবে। পরপর কয়েকদিন সে ঠাকুরঝির সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু মনের মধ্যে তখন শুরু হল অসহ্য যন্ত্রণা। ঠাকুরঝিকে সে বলতে চায় সেই যন্ত্রণার কথা। কিন্তু বলতে গিয়েও বলা হল না। সেই না বলা কথাটা গানের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল—

বলতে তুমি বলো নাকো, (আমার) মনের কথা থাকুক মনে
(তুমি) দূরে থাকো সুখে থাকো আমিই পুড়ি মন আগুনে।

গান গাইতে গাইতে সে চলে গেল বাবুদের বাগানের দিকে। বাগানের প্রত্যেকটি গাছকে শুনিয়ে সে গাইল—

সাক্ষী থেকে তরুলতা শোন আমার মনের কথা
এ বুকে যে কত বেথা—বোঝ বোঝ অনুমানে
আমিই পুড়ি মন-আগুনে।

অপ্রাপনীয়কে পেতে গিয়ে যে ব্যর্থতা এবং সেই ব্যর্থতা জনিত কারণে তিলে তিলে দগ্ধ হওয়ার যে যন্ত্রণা—তা ফুটে উঠেছে গানটির মধ্য দিয়ে।

এইভাবে ঠাকুরঝিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে গানগুলি।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের গানগুলি সৃষ্টি হয়েছে বসনকে কেন্দ্র করে। বসন ঝুমুরদলের নায়িকা। বসনের সঙ্গে তার প্রথম আলাপের মধ্যে প্রেমের কোনো চিহ্ন ছিল না। বরং প্রগলভা এই নারীটিকে গানের মধ্য দিয়ে একটা আঘাত দেবার তীব্র বাসনা তার মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। নিজের রূপ সম্পর্কে গরবিনী এই নারী নিতাইকে 'কয়লা মানিক' বলে সম্বোধন করেছে। নিজ দেহের স্বর্ণাভ রঙের ছটায় সে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। আর সেই সঙ্গে বিদ্রূপাত্মক কথায় সকলকে হেয় করবার চেষ্টা করেছে। নিতাইও সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তাই ঝুমুরদলের আসরে গান গাইতে নেমেই সে আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু করে নিয়েছিল বসনকে—

আহা রাঙাবরণ শিমুল ফুলের বাহার শুধু সার
ও গো সখি দেখে যা বাহার।
শুধুই রাঙা ছটা, মধু নাই এক ফোঁটা
গাছের অঙ্গে কাঁটা খরধার
মন ভোমরা যাসনে পাশে তার।

শিমুল ফুলের ইংগিতটা যে তারই প্রতি একথা বুঝতে বুদ্ধিমতী নারী বসনের বিন্দুমাত্র দেরি হয় নি। সে ক্ষিপ্ত হয়ে আসর ছেড়ে চলে যেতে চাইলে নিতাই হাত জোড় করে তার কাছে ক্ষমা চায় তখন সে শান্ত হয়, আবার নাচ শুরু করে সে। নাচ শেষ করে ক্লান্ত দেহে সে চলে যায় নিতাইয়ের বাসায়। নিতাই আসে তার পিছু পিছু। মেয়েটির প্রতি এক ধরনের করুণা বোধ করে সে। অসুস্থ মেয়েটির সেবায় মত্ত হয় সে। আসরের গানটির জন্য সে বসনের কাছে অনুতাপ প্রকাশ করে এবং নতুন একটা গান বেঁধে

শোনায় তাকে—

করিল কে ভুল হায় রে?
মন মাতানো বাসে ভরে দিয়ে বুক
করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল।

করাত-কাঁটা ঘেরা কেয়াফুলটির মানান সই হয়ে যায় বসনের স্বভাবধর্মের সঙ্গে। বসনই কেয়া ফুল। পরদিন ঝুমুর দল চলে গেলে নিতাই এসে বসে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। ভাবতে শুরু করে গতকাল রাতের কথা। ঝুমুর দঙ্গল সে অনেক নারী দেখেছে কিন্তু বসনের মতো এমন নিষ্ঠুর ব্যবসায়িনী ক্ষুরধার মেয়ে সে দেখেনি। মেয়েটি যেন সর্বদাই জ্বলছে।

ইতিমধ্যে জানালা দিয়ে বসন্ত ও নিতাইয়ের মিলনদৃশ্য দেখে ঠাকুরঝি পাগল হয়ে যায়। তার পাগল হবার মূল কারণ যে নিতাই—এটা জেনে রাজনের স্ত্রী তাকে অশ্রাব্য কুৎসিত গালাগাল দেয়। নিতাইয়ের মন অবসন্ন হয়ে ওঠে। সে গ্রাম পরিত্যাগ করার সংকল্প করে। এমন সময় আসে ঝুমুরদলের নেত্রী মাসির কাছ থেকে কবিয়াল হিসেবে গান করার আহ্বান। কোনও দ্বিরুক্তি না করে সে চলে যায় আলেপুরের মেলায় ঝুমুরদলে যোগদান করার জন্যে। ট্রেনে বসেই সে গান গায়—বিষণ্ণ বেদনার গান—এ গান ঠাকুরঝির উদ্দেশ্যে—

চাঁদ তুমি আকাশে থাক,
আমি তোমায় দেখব খালি।
ছুঁতে তোমায় চাইনা কো চাঁদ,
তোমার সোনার অঙ্গো লাগবে কালি।

কিন্তু এর পরেই জেগে ওঠে সুতীব্র অভিমান, গানেই তা প্রকাশ পায়—

না, না তাও করো মার্জনা—
আজ থেকে আর তাও দেখবনা।
জানতাম নাকো এই দু-চোখের
দিষ্টিতে বিষ দেয় হে ঢালি।

নিতাই ট্রেন থেকে নেমে পড়ল কিন্তু গান থামল না—

তাই চলেছি দেশান্তরে আঁধার খুঁজেই ফিরব ঘুরে।

কিন্তু আলেপুরে এসে বসন্তের টান এবং মেলার টানই তার কাছে বড়ো হয়ে উঠল। ঠাকুরঝির চিন্তাকে অতিক্রম করে বসন্তের চিন্তা মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা জাগিয়ে তুলল। আজ সে আসরে নামবে—সে গাইবে, বসন্ত নাচবে অন্য কাউকে নাচতে দেবেনা সে। এ সব কল্পনার মাঝে তার মনে গানের কলি এসে গেল ঃ

ব্রজ গোকুলের কূলে কালো কালিন্দীরই জলে
হেলে দোলে ওরে সোনার কমলা
কালো হাতে ছুঁয়ো-নাকো
লাগিবে কালি ওহে কুটিল কালা।

শুরু হল বসন্তকে নিয়ে নতুন জীবন। বসন্ত হয়ে উঠল নতুন নতুন গানের উৎস।

কিন্তু নতুন জীবনকে বরণ করে নিলেও সে ঠাকুরঝিকে ভুলতে পারে না। মনে মনে ভাবে এখান থেকে ছুটে গিয়ে সে ঠাকুরঝিকে নিয়ে দেশান্তরী হয়ে যাবে। কিন্তু পরমুহূর্তে সে ভাবে ঠাকুরঝির সংসার স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে শান্তিতে কাটুক। পরের দিন সকালে বৈষ্ণব বাবাজির আখড়ায় রাধা-গোবিন্দকে দেখে তার অশান্ত মন শান্ত হল। সে গেয়ে উঠল—

আশ মিটিয়ে দেখরে নয়ন যুগল রূপের মাধুরী

বৈষ্ণব বাবাজির সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে তার মনের কালিমা কেটে গেল। ঝুমুরদলের মেয়েদের প্রতি তার মনের কোণে যেটুকু ঘৃণা ছিল তাও অন্তর্হিত হয়ে গেল। আখড়া থেকে ফিরে এসে ঝুমুরদলের মেয়েদের অন্য একটি রূপ দেখে নিতাই বিস্মিত হয়ে গেল। লক্ষ্মীপুজো ও ব্রত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে—তাদের শান্ত স্নিগ্ধরূপ মূর্তি নিতাইয়ের মনকে অভিভূত করল। বিশেষ করে বসন্তের প্রতি সে এক অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করল। এই আকর্ষণই ধীরে ধীরে প্রেমে পরিণত হল। তাদের প্রেমের গাঢ় রূপ দেখেই ঝুমুর দলের মেয়েরা নিতাইকে 'বসন্তের কোকিল' বলে অভিহিত করল। বসন এবং নিতাই—উভয়েই এ নামের তাৎপর্য বুঝল এবং সাগ্রহে বরণ করে নিয়ে নিতাই একটা গান বাঁধল—

তোরা—শুনেছিস কি বসন্তের কোকিল ঝঙ্কার
বাঁশি কি সেতার—তার কাছে ছার
সে গানের কাছে সকল গানের হার।

কিন্তু এ সবের মাঝেই আবার মাঝে মাঝে ঠাকুরঝির কথা তার মনে ভেসে ওঠে। বসন্তকে সে ভালোবাসল কিন্তু ঠাকুরঝিকে সে ভুলল না। বসন্তের ঘর লোক আসলে সে গাছতলায় শুয়ে বিরহের গান বাঁধে, ঠাকুরঝির সঙ্গে মনে মনে কথা কয়। এ ভাবেই তার ছন্নছাড়া জীবন কাটে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই ক্ষয়রোগ বাসা বাঁধে, বসন্তের দেহে। তবু বসন্ত নাচে, প্রেমের অনির্বচনীয় পরশ পেয়েছে সে, কোনও কিছুই তাকে দমাতে পারছে না। নিতাইও তাকে আদরে যত্নে নিমজ্জিত করে রাখে। তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। বসন্ত অভিমান করে কাঁদে, নিতাই হেসে তার চোখ মুছিয়ে দেয়। বসন্ত কাঁদতে শুরু করলে নিতাই তাকে গানের সুরে বলে—

তোমার চোখে জল দেখিলে সারা ভুবন আঁধার দেখি—
তুমি আমার প্রাণের অধিক জেনেও তাহা জান নাকি?

বসন্ত মনে মনে সুখী হয় মুখে তার হাসি ফোটে। নিতাইয়ের অসমাপ্ত গান হারিয়ে যায় আনন্দের আতিশয্যে।

কিন্তু মনের মধ্যে যখন ঠাকুরঝির ছবি ভেসে ওঠে তখন মন উদাসী হয়ে ওঠে। মনে পড়ে যায় সেই রেল স্টেশন—কৃষ্ণচূড়া গাছ—দূরে রেললাইনের বাঁকে রৌদ্রচ্ছটা প্রতিবিম্বিত একটি স্বর্ণ বিন্দু। আবার এদিকে বসন্ত, বসন্তকে সে কথা দিয়েছে সে যতদিন বেঁচে থাকবে তাকে ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না। বসন্ত সুস্থ হয়ে উঠুক, বসন্ত বেঁচে থাকুক। বসন্তকে নিয়েই সে এ জীবন কাটিয়ে দেবে। এই তো কয়দিনের জীবন—কয়েকটা

দিন মাত্র তারপরই জীবন শেষ—মৃত্যুর নিশব্দ আগমন। সেই আসন্ন মৃত্যুর বার্তা বহন করে এনেছে এই গানটি—

এই খেদ আমার মনে মনে
ভালোবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এজীবনে।
হায় জীবন এতো ছোটো কেনে?

জীবন এত ছোটো কেনে—এ প্রশ্ন মানুষের চিরকালের। ভীমকান্ত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আকণ্ঠ জীবন-পিপাসা নিয়ে মানুষের এই চিরন্তন খেদ আশ্চর্য বাণীরূপ পেয়েছে গানটির মধ্যে। Our sweetest songs are those that tell us saddest thought—এরই এক উজ্জ্বল উদাহরণ গানটি। অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা নিয়ে কে বিদায় নিতে চায় এই পৃথিবীর বুক থেকে? ঠাকুরঝির সঙ্গে প্রেম ব্যর্থ হয়ে গেল—বসন্তের সঙ্গে প্রেম অচরিতার্থ থেকে গেল—মৃত্যু এসে বাধা হয়ে দাঁড়াল—তাই তো নিতাইয়ের আকুল প্রশ্ন 'জীবন এত ছোটো কেনে'। এ প্রশ্ন কাঁপিয়ে তোলে বসন্তের বুক। একদা গরবিনী এই নারী নিজের অন্তরের মধ্যে মৃত্যুর পদধ্বনি অনুভব করে জীর্ণ মলিন বিছানায় লুটিয়ে পড়ে আর্তনাদ করেছে। তারপর মৃত্যু এল। স্বামী পুত্র ঘর-সংসারের স্বপ্ন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। একটি ভাগ্যহত নারীর জীবন-তৃষ্ণা এ ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

কিন্তু মৃত্যু কি কারুর মন থেকে তার প্রেমাস্পদের স্মৃতিকে মুছে দিতে পারে? বসন্তের মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু চোখ বুজলেই নিতাইয়ের মনে বসন্তের ছবি ভেসে ওঠে। মনে হয় বসন্ত তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কথা বলছে, এখানেই মৃত্যুর পরাজয়। যুগে যুগে এই ভাবেই মরণজয়ী স্মৃতি মৃত্যুকে পদানত করে। তাই নিতাই গান গেয়ে ওঠে—

মরণ তোমার হার হল যে মনের কাছে
ভাবলে যারে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে
মনের মাঝেই বসে আছে।

এর পর দীর্ঘদিন নিতাইয়ের উদাসীন পথপরিক্রমা, কাশী বিশ্বনাথ দর্শন—সেখানেও গান রচনা করেছে কিন্তু মন মানেনা। গৃহ কাতর মন গৃহে ফিরতে চায়—জন্মভূমির টান অপ্রতিরোধ্য। তাই স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন। একটির পর একটি পরিচিত জনপদ অতিক্রম করছে। নদীর দুপাশে ভাঁট ফুল, কেয়া ঝোপ, কাশঝাড়—সবই তার আপন, তার পরিচিত। নিতাইয়ের মন নেচে উঠছে এতো তার গ্রাম—এই গ্রামই তার মা। আনন্দের অতিশয্যে তার চোখে নেমে আসে জলের ধারা। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে—তার আকুল আবেদন—

তোর সাড়া না পেলে মা কিছুতে যে মন ভরেনা
চোখের পাতায় ঘুম ধরে না, বয়ে যায় জলের ধারা

স্টেশনে নামা মাত্রই ঘিরে ধরেছে তার পরিচিত জনেরা—বেনে মামা, দেবেন, কেষ্ট দাস, রামলাল সর্বোপরি রাজন। রাজনকে নিয়ে নিতাই চলে এল তার প্রিয় কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে। সেখানেই সে শুনল মর্মান্তিক সংবাদ—ঠাকুরঝি নেই। আর একবার দুঃসহ যন্ত্রণায় তার হৃদয় মুচড়ে উঠল বাণবিদ্ধ হরিণের মতো। তাঁর দুঃখক্ষত হৃদয় থেকে উৎসারিত হল আবার সেই পুরোনো গান—

জীবন এত ছোটো কেনে?

সমগ্র উপন্যাসটিতে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ নিতাইয়ের কবিয়াল রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্রম-বিকাশের ধারাটি সুনিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। তার কবিয়াল হয়ে ওঠার পিছনে নেপথ্যচারিণী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে দুটি নারী, ঠাকুরঝি এবং বসন্ত। তার জীবনের দুটি পর্বে এই দুটি নারী নানাভাবে তার কবি-সত্তাকে জাগরিত করেছে, তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে এই উপন্যাসের অধিকাংশ গানই তার ব্যক্তি সত্তার নিবিড় অনুভূতিতে ভরা, প্রাণপর্শী এবং সজীব।

কিন্তু এই উপন্যাসে নিতাইয়ের গান ছাড়াও অন্যান্য কবিয়ালদের গান আছে। গান আছে বসন্তেরও। কবিয়ালদের গানগুলির কোনও তাৎপর্য নেই, গানগুলির অধিকাংশই অশ্লীল, তৎক্ষণিক প্রয়োজনে রচিত। কিন্তু বসন্তের গাওয়া গানগুলির মধ্যে অন্তত দুটি গান আছে যা ব্যঞ্জনাধর্মী, তার অন্তর্নিহিত সত্তার পরিচয়বাহী। সে ঝুমুর দলের নায়িকা। গৌরবর্ণা অসাধারণ সুন্দরী, নাচে গানে অত্যন্ত দক্ষ। ঝুমুরদলের অধিকাংশ মেয়েদের মতো সে রূপোজীবিনী। কিন্তু সে বুদ্ধিমতী। কোন্ আসরে কোন্ ধরনের গান গেয়ে লোকের মনকে মুগ্ধ করেত হয় তা সে জানে। তাই স্টেশন সংলগ্ন স্থানে ঝুমুরদলের আসরে সে তার সবচেয়ে প্রিয় গানটি গেয়েছে। গানটির সঙ্গে নাচের একটা নিবিড় যোগ আছে—

ঝুম ঝুমাঝুম বাজে লো নাগরী
নুপূর চরণে মোর। ... ...
রজনি হইল ভোর—আয় সখী আয় গো
নিশি যে ফুরায় গো।

নৃত্য পটিয়সী সুকণ্ঠী এই গায়িকার আপাত ক্ষুরধার রূপের অন্তরালে একটি শান্ত স্নিগ্ধ রূপও যে বর্তমান ছিল গানটি তার ইঙ্গিত বহন করছে।

এই নারীটি যে কোনো পুরুষকে ভালোবাসতে পারেনি সে নিতাইয়ের নিবিড় সান্নিধ্যে এসে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে—তার প্রেমের বন্ধনে সে ধরা দিয়েছে। তার সেই আত্মসমর্পিত মনের বাসনা ধরা পড়েছে নীচের গানটির মধ্যে—

তোমার চরণে আমারই পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি
জাতি কুলমান সব বিসর্জিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।

একটি বেপোরয়া কালিমালিপ্ত উদ্দাম জীবন কীভাবে প্রেমের উষ্ণ স্পর্শে নমনীয় হয়ে গেল তারই পরিচয় বহন করছে গানটি। অনুরূপ আর একটি গানের মধ্যে তার প্রেম তৃপ্ত মনের ছবিটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে—

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম গরব টুটাবে কে?
তেজি জাতি কুল বরণ কৈলাম তোমারে সঁপিয়া দে।

এইভাবে অসংখ্য গানে পূরিপূরিত হয়ে উঠেছে 'কবি' উপন্যাসটি। গানগুলি বাদ দিলে উপন্যাসটি একটি পত্রপুষ্পহীন বৃক্ষের মতো দেখাবে।